ISSN 1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দশম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১২/নভেম্বর ২০০৫

এনজিও পরিচালিত হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নারীর অবস্থান একটি সমীক্ষা

তারানা বেগম*

Abstract: *In Bangladesh culture, gender discrimination starts at birth and continues throughout life. Bangladeshi women are not without work. Though they spend long hours in productive activities, their role as income earner is not recognized. There's an old folk says 'Man works from sun to sun, but women's work is never done'. But women's work , has been undervalued and usually unpaid. Women's participation in income earning activities is expanding. A large number of women workers are involved with NGO organized rural development program. This involvement has a positive impact on women. Women who were previously oppressed and insecured become assertive and they have got greater control in their family decision making process. They are also able to reduce their economic dependency on men. Positive changes have taken place in their social and economic status. Considering the above facts, the present study deals with the social and economic status of rural working women who are involved in NGO organized handloom program.*

ভূমিকা

কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে নারীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমাজে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকার বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। সত্তর এর দশক থেকে বিশ্বব্যাপী নারী বিষয়ে যে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রভাব বাংলাদেশেও দেখা যায়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গতানুগতিক শ্রমবাজার ও লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের যে ধারা চলে আসছিল তার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে অধিক সংখ্যায় নারী ভূমিহীনতা, সামাজিক অবস্থা, দারিদ্র্য ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। গ্রামীণ নারীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পুরুষের পাশাপাশি পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব কাঁধে নিচ্ছে। গ্রামীণ নারী-শ্রমিক যারা সমাজের প্রথাগত নিয়মের বেষ্টনী ছিন্ন করে অর্থ উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতটুকু উন্নতি হয়েছে, তারা কতটুকু সচেতন হয়েছে তা জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টা খুব বেশি দিনের নয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অপর্যাপ্ত সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) নারীর অধস্তন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে আসে। আয়মূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর অবস্থার উন্নয়নে প্রয়াসী হয় এসব সংস্থা। এ প্রেক্ষাপটেই ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) ও উবিনীগ (উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা) নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়।

---

* প্রভাষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐতিহ্যগতভাবে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সাথে বাংলাদেশের নারী সমাজ যুক্ত থাকলেও তাদের তাঁতী হিসেবে গণ্য করা হতো না। প্রাক-বুনন কাজের মধ্যেই নারীর বিচরণ সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাক-বুনন কাজকে কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো না এবং এর অর্থনৈতিক মূল্যও ছিল না। তারপরও বাংলার নারী সমাজ তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত থেকে এ' শিল্পের বিকাশে অবদান রেখেছে। সভ্যতার অগ্রগতি, বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার ও পাওয়ারলুমের ব্যবহারের কারণে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অতীত গৌরবোজ্জল অবস্থা আর নাই। পর্যাপ্ত সুযোগ ও সমর্থনের (support) অভাবে এ' শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। এ' শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে দেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে এর সাথে যুক্ত তাঁতী ও কারিগরদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে ব্র্যাকের অঙ্গসংগঠন আড়ং ও আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন এবং উবিনীগ পরিচালিত প্রবর্তনা। আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন ও উবিনীগ মনে করে পর্যাপ্ত সমর্থন, প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা, ডিজাইন, বাজারজাতকরণের সহায়তা পেলে এ' শিল্পের উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে এবং এ' শিল্পের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো এনজিও পরিচালিত হস্তচালিত তাঁতশিল্পে (Handloom Industry) নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা এবং হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিয়োজিত হয়ে নারী স্বাবলম্বী হতে পারছে কিনা, তা অনুসন্ধান। নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা ও উপার্জন তার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার (পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মত প্রকাশ) ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করছে কিনা, তা অনুসন্ধান।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণা কর্মটি প্রধানত প্রাথমিক তথ্য নির্ভর হওয়ায় গবেষণা কৌশল হিসাবে এখানে জরিপ পদ্ধতি (survey method) ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় মূলত দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে- প্রাথমিক উৎস (Primary Source): এ ক্ষেত্রে প্রশ্নমালার সাহায্যে মাঠ পর্যায় থেকে অর্থাৎ গবেষণা এলাকার ১০০ জন শ্রমিকের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস (Secondary Source): গবেষণার প্রয়োজনে দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যের জন্য বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, সরকারি বেসরকারি সমীক্ষা, বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রিপোর্ট ইত্যাদির সহায়তা নেয়া হয়।

গবেষণা এলাকা

গবেষণা এলাকা হিসাবে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন ও প্রবর্তনার দুটো উৎপাদন এলাকাকে বেছে নেয়া হয়েছে। গবেষণা এলাকার একটি হচ্ছে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার পাথরাইল ইউনিয়নের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামে অবস্থিত প্রবর্তনার উৎপাদন কেন্দ্র। টাঙ্গাইলের ১৯টি গ্রামে প্রবর্তনার কার্যক্রম বিস্তৃত। প্রবর্তনার সাথে যুক্ত তাঁতীরা বাড়ী ও কারখানা ভিত্তিক কাজ করে। বর্তমান গবেষণায় বিষ্ণুপুর, কৈজুড়ি, নুরুন্দা, চন্ডী গ্রামে বসবাসরত প্রবর্তনার সাথে যুক্ত তাঁতীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় গবেষণা এলাকা হিসাবে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের বেতিলা ও গড়পাড়া উপকেন্দ্র দুটিকে বেছে নেয়া হয়েছে। মানিকগঞ্জ সদর থানার ১০ কি: মি: দূরে বেতিলা মিতুরা ইউনিয়নের পালোরা নামক স্থানে বালুবাড়ি জমিদার বাড়ীতে 'বেতিলা উপকেন্দ্রটি' অবস্থিত। গড়পাড়া

ইউনিয়নের আলীনগর নামক স্থানে 'গড়পাড়া উপকেন্দ্রটি' অবস্থিত; যা মানিকগঞ্জ সদর থানা প্রধান বাসস্ট্যান্ড হতে ৬ কি: মি: দূরে অবস্থিত।

বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অতীত-বর্তমান

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হস্তচালিত তাঁতশিল্প (Handloom Industry) একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। গ্রামীণ শিল্পায়নে এ'শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। হস্তচালিত তাঁতশিল্প বর্তমানে দেশে মোট কাপড় উৎপাদনের ৭৭ ভাগ উৎপাদন করছে এবং দেশের মোট কাপড় সরবরাহের ৬৯ ভাগ যোগান দিচ্ছে।[১] প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এ'শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কাজের সাথে যুক্ত।[২] তাঁতশিল্প দেশের শিল্পখাতের জাতীয় উৎপাদনে (GDP) শতকরা ১৫ ভাগ অবদান রাখছে।[৩] বস্ত্রকলগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে এ'শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। তাছাড়া তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত তাঁতীদের মূলধনের অভাব, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, উৎপাদন উপকরণের নিয়মিত সরবরাহে সংকট, গ্রামাঞ্চলে অবকাঠামোগত অসুবিধা ও বাজারজাতকরণের অসুবিধা ইত্যাদি দেশে তাঁতশিল্পের বিকাশের অন্যতম প্রতিবন্ধক। সরকার এ'শিল্পকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তাঁতশিল্পের অবস্থা বেশ নাজুক ও প্রবৃদ্ধির হার খুবই কম।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে। তখন বাংলাদেশী মানসম্পন্ন কাপড়ের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। মসলিনের (Muslin) সুনাম ছিল দেশ ও বিদেশের বাজারে। মসলিন সহ অন্যান্য বাংলাদেশী কাপড় ইউরোপের বাজারে রপ্তানী করা হতো। ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এক গবেষণায় দেখান, শুধুমাত্র ঢাকা থেকে ১৭৫০ সালের দিকে ৯.৩ মিলিয়ন টাকার এবং ১৭৮৭ সালের দিকে ৫.০ মিলিয়ন টাকার মসলিন শাড়ী ইউরোপীয় দেশে রপ্তানী করা হতো।[৪] মোগল শাসনামলে ভারতে তাঁতশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এসময়টি ছিল হস্তচালিত তাঁতশিল্পের স্বর্ণযুগ। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মসলিন সহ অন্যান্য কাপড় উৎপাদিত হতো। এ'সময় রপ্তানী বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে মসলিনের বাজারে ধ্বস নামে। এদেশীয় কাপড় বিদেশের বাজার হারায়। মসলিনের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়। মসলিনের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়ার সাথে সাথে ভারতীয় অন্যান্য কাপড়ের উৎপাদন ব্যাহত হয় ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে। এ'সময় ল্যাঙ্কাশায়ার (Lancashire) ভিত্তিক ব্রিটিশ বস্ত্রকলগুলো বাস্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করে কম খরচে কাপড় উৎপাদন শুরু করে। অনুকূল বাণিজ্যনীতির কারণে ল্যাঙ্কাশায়ারে উৎপাদিত কাপড়ে ভারতীয় বাজার ছেয়ে যায় এবং ভারতীয় কাপড় বিদেশের বাজার হারানোর সাথে সাথে দেশীয় বাজারও হারায়। অন্যদিকে ১৮৫০ সালের দিকে এসে ভারতে বস্ত্রকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। হস্তচালিত তাঁতশিল্প এতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরবর্তীতে দেখা যায় এসব বস্ত্রকলগুলো উন্নতমানের সুতা (yarn) সরবরাহ করে তাঁতশিল্পের সহায়ক হিসাবে কাজ করতে থাকে। এতে তাঁতশিল্পগুলো পর্যাপ্ত উৎপাদন উপকরণের যোগান পেয়ে টিকে থাকার প্রয়াস পেলেও হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সাথে পরোক্ষভাবে যারা যুক্ত, যেমন চরকায় যারা সুতা কাটতো তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানায় সুতা উৎপাদনের ফলে ভারতে লাখ লাখ চরকা শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এর প্রথম শিকার হন নারীরা। কারণ চরকায় সুতা কাটার সাথে নারীরা সিংহভাগ যুক্ত ছিলেন। বস্ত্রকারখানার নেতিবাচক প্রভাবে নারীরা কর্মহীন হয়ে পড়ে।

এসময় (১৯০১-১৯৪১) অবিভক্ত বাংলায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পৃথক কোন হিসাব পাওয়া যায় না। GOI (১৯২৩) পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলায় ১৯০১ সালের দিকে ৫,৭৬,০১৫ জন শ্রমিক ও ১৯২১ সালের দিকে ৫,২০,৯০৭ জন নারী পুরুষ তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত ছিল।[৫] GOI (১৯৪২) পরিচালিত অন্য এক সমীক্ষায় দেখানো হয় যে, ১৯২১ সালে বুনন কাজের সাথে যুক্ত ছিল ২,১১,৩৫৪ জন এবং ১৯৩১ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ২,১৩,৮৮৬ জনে; যার প্রায় সবাই ছিল পুরুষ।[৬] নারীরা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল তাঁতশিল্পের সাথে। ১৯৩০ সালের দিকে বাংলায় বস্ত্রকল স্থাপিত হলে তাঁতশিল্প সরাসরি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। ১৯৪১ সালের পর বাংলায় তাঁতশিল্পের বিকাশ ঘটে ধীরে ধীরে। ১৯৪১ সালে বাংলায় তাঁতসংখ্যা ছিল ৮৫.৪৮ হাজার যা ১৯৪৬ সালে ১৩৪.৩৫ হাজারে উন্নীত হয়।[৭]

সারণি-১: বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ক্রমবিকাশ (১৯৪৬-৯০)

বৎসর	হিসাব (Enumeration)	তাঁত সংখ্যা (হাজার)		শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)	
		সংখ্যা	প্রবৃদ্ধির হার(%)	সংখ্যা	প্রবৃদ্ধির হার(%)
১৯৪৬	টেক্সটাইল কমিশনার, ভারত	১৩৪.৩৫	-	-	-
১৯৫১	আদমশুমারী, পাকিস্তান	১৮৩.২৫	৬.৪১	৪০৭.৩৩	-
১৯৫৬	টেক্সটাইল কমিশনার, পাকিস্তান	২৫০.০	৬.৪১	-	-
১৯৬২	পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা	২৭১.৪১	১.৩৮	৫৬৫.৮৪	৩.০৩
১৯৮৭	তাঁত শিল্প জরীপ, বিআইডিএস	৪২৫.৩১	২.২৬	-	-
১৯৯০	বাংলাদেশ তাঁত শুমারী	৪৩৬.৭১	১.৭৩	৯৯৮.৩৭	১.৩৭

উৎস : Latif, Muhammad Abdul, *Handloom Industry of Bangladesh:* 1942-90, University Press Limited, Dhaka, 1997, P. 13

বাংলাদেশে চার ধরনের তাঁত উৎপাদনে নিয়োজিত। সেগুলো হলো: (ক) নিক্ষেপ মাকু তাঁত (Throw-Shuttle loom), (খ) দ্রুত মাকু তাঁত (Fly-shuttle loom), (গ) চিত্তরঞ্জন তাঁত বা আধা স্বয়ংক্রিয় তাঁত (Chittaranjan loom/semi-automatic loom) (ঘ) হাটার্সলি তাঁত (Huttersley Pedal loom)।[৮] এছাড়াও বাংলাদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের উপজাতীয়দের মধ্যে কোমর-বন্ধ তাঁত (kamer/Waist loom) নামে এক ধরনের তাঁত প্রচলিত আছে। এটি অত্যন্ত প্রাচীন ধরনের তাঁত। পাহাড়ী উপজাতি মেয়েরা কোমর-বন্ধ তাঁতের প্রধান কারিগর।

১৯৯০ সালের তাঁত শুমারী হতে দেখা যায় যে, দেশে ২,১২,৪২১টি তাঁত ইউনিটে ৫,১৪,৪৫৬টি তাঁত (looms) রয়েছে এবং প্রতি ইউনিটে গড়ে ২.৪২টি তাঁত রয়েছে; প্রতি ইউনিটে কার্যকর (operational) ও অ-কার্যকর (non-operational) তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে ১.৬৫ ও ০.৭৬।[৯] মোট তাঁত ইউনিটের মধ্যে ২০৯, ৮৪৮ (৯৮.৯%) পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মালিকানায়, ২,২১৭ (১%) অংশীদারিত্বমূলক মালিকানায় এবং মাত্র ৩৫৬ টি তাঁতীদের সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।[১০] তাঁতশিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় মূলত পারিবারিক ইউনিট (household unit) ও কারখানা ইউনিটের মাধ্যমে। পারিবারিক ইউনিটগুলো আকারে ছোট হয় এবং উৎপাদন কর্মকাণ্ডের জন্য আলাদা কোন স্থান থাকে না। বসত ঘরের মধ্যে, বারান্দায় বা উঠানে উৎপাদন কাজ চলে। পরিবারের সদস্যরাই এখানে শ্রম দেয়; পারিবারিক ইউনিটে নারীরা নিযুক্ত হন সবচেয়ে বেশি এবং তারা অবেতনভুক পারিবারিক শ্রমিক হিসেবে প্রাক-বুনন ও বুনন কাজে যুক্ত হন। কারখানা

ইউনিটগুলো আকারে বড় হয়। উৎপাদনের জন্য পৃথক কর্মশালা, ভাড়া শ্রমিক ব্যবহৃত হয়। কারখানা ইউনিটে নারী শ্রমিকরা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করলেও মজুরী শ্রমিক হিসাবে পুরুষদের আধিপত্যই লক্ষ্য করা যায় তাঁত কারখানাগুলোতে। বেশিরভাগ কারখানা পরিচালিত হয় মহাজনের মাধ্যমে। সাধারণতঃ ১-৫ টি তাঁত যুক্ত ইউনিটগুলিকে পারিবারিক ইউনিটের আওতায় এবং ৬ বা তার বেশি তাঁতযুক্ত ইউনিটগুলিকে কারখানা ইউনিটের আওতায় ফেলা হয়।[১১]

সারণি -২: তাঁত ইউনিটের আকার ও লিঙ্গভিত্তিক শ্রমিক সংখ্যার বণ্টন

ইউনিটের আকার	ইউনিট সংখ্যা	মোট শ্রমিক	পারিবারিক শ্রমিক		ভাড়া শ্রমিক	
			পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
১টি তাঁত	১১৩,৬৪৯	২৫৬,১৭০	৯০,২৬০	১১৭,৩৩৭	২৩,৬২২	২৪,৯৫১
২-৩ তাঁত	৬৭,৫৪৭	৩২৬,৩৮৭	১০৬,৫৪৩	১০৯,৪৯১	৬৫,০২০	৪৫,৩৩৩
৪-৫ তাঁত	১৫,৪২১	১৩৪,৪৪৯	৩৩,৩০০	২৮,৫৫৫	৪৭,২৫৯	২৫,৩৩৫
৬-১০ তাঁত	১০,৪৭৬	১৪৮,৯৫৮	২৭,৮৮৪	২২,৩৮৪	৬৭,২৪৩	৩১,৪৪৭
১১-১৯ তাঁত	৩,৪৫৩	৮২,৩৬৯	১৩,০১৮	৯,৫৫৭	৪১,৯৭৭	১৭,৮১৭
২০+	১,৮৭৫	৭৯,০৭৪	১১,৪৮১	৬,২১৬	৪৪,১৫৮	১৭,২১৯
মোট	২১২,৪২১	১,০২৭,৪০৭	২৮২,৪৮৬	২৯৩,৫৪০	২৮৯,২৭৯	১৬২,১০২

উৎস: BBS, *Report on Bangladesh Handloom census 1990*, Bangladesh Bureau of Statistics, January 1991, p. 41

তাঁতশিল্পের সাথে পুরুষ শ্রমিকরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত; এরা তাঁতী হিসাবে বিবেচিত। নারী শ্রমিকগণ তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত থাকলেও তারা তাঁতী হিসাবে বিবেচিত হন না। নারী শ্রমিক মূলত প্রাক-বুনন কর্মকাণ্ডে যেমন, নলী ভরা, ববিন পেচানোর কাজে নিয়োজিত। খুব কম নারীই বুনন কাজে অংশগ্রহণ করে। বেসরকারি সংস্থা যেমন গ্রামীণ উদ্যোগ, আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন, প্রবর্তনা'র উদ্যোগে নারী বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি বুনন কাজে সমান হারে অংশগ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)

দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম সংস্থা ব্র্যাক মূলতঃ একটি "Multifaceted Development Organization"।[১২] যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড শুরু হয় সিলেটের সাল্লা (Sulla) অঞ্চলে। ব্র্যাকের কার্যক্রমের তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ছিল ত্রাণ তৎপরতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি, দ্বিতীয় পর্যায়ের সকল তৎপরতার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল গ্রাম উন্নয়ন (Community Development Approach); এ পর্যায়ে মহিলাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচি গৃহীত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে শুরু হয় টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ।[১৩] ব্র্যাক দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণদান, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরী জ্ঞান, সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। ব্র্যাক তার কর্মসূচিতে ঐসব গ্রামীণ নারীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে যারা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত (Most disadvantaged among the rural poor).[১৪]

আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন ও আড়ং

আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন এমন একটি সংস্থা যার উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উৎপাদন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে তাদের আয় বৃদ্ধি করা। আয়েশা আবেদ ১৯৭৬ সালে মানিকগঞ্জে এবং ১৯৭৯ সালে জামালপুরে হস্তশিল্প প্রকল্প চালু করেন। ১৯৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জে প্রথম আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন স্থাপিত হয়। বর্তমানে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের পাঁচটি কেন্দ্র (মানিকগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, শেরপুর) ও এসব কেন্দ্রের অধীনে ২৪২টি উপকেন্দ্র রয়েছে; যেখানে ১২,৫৭৭ জন নারী কাজ করছে।[১৫] ১৯৭৮ সালে ব্র্যাকের বিপণন কেন্দ্র আড়ং (Aarong) এর আবির্ভাব ঘটে। আড়ং মানে হচ্ছে গ্রামীণ মেলা (A Village Fair)।[১৬] আড়ং এর লক্ষ্য হলো গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী কারু ও হস্তশিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং এর সাথে যুক্ত শিল্পী ও কারিগরদের কর্মসংস্থান, সার্ভিস সুবিধা ও বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করে তাদের অবস্থার উন্নয়ন করা। সমগ্র বাংলাদেশে আড়ং এর সাতটি শাখা রয়েছে ও ৩০,০০০ অনগ্রসর শিল্পী-কারিগর বর্তমানে আড়ং পরিচালিত কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত, যার ৮৫% নারী।[১৭] আড়ং এর উৎপাদন কেন্দ্র আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের মানিকগঞ্জ কেন্দ্রের অধীন আটটি উপকেন্দ্র রয়েছে। বেতিলা ও গড়পাড়া উপকেন্দ্রে তাঁত (Weaving) কাজের সাথে সাথে সেলাই, এমব্রয়ডারী এর কাজ হয়। তাঁত সেকশনে বেতিলা উপকেন্দ্রে মোট ৯৪ জন শ্রমিক কাজ করছে। গড়পাড়া উপকেন্দ্রে ১৪৩ জন শ্রমিক তাঁতের কাজ করছে। মোট ২৩৭ জন শ্রমিক উপকেন্দ্র দুটিতে তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত।

সারণি-৩ : তাঁত কাজের সাথে যুক্তদের কাজের ধরন

কাজের ধরন	বেতিলা উপকেন্দ্র		গড়পাড়া উপকেন্দ্র		মোট
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	
প্রাক-বুনন/নাটাইনলী	৬৫	-	৪৪	-	১০৯
তাঁত/বুনন	১৩	১০	৮৪	-	১০৭
রং করা ও সূতা শুকানো	১	২	৫	১	৯
ব' তোলা	-	১	১	১	২
ড্রাম	১	১	-	-	২
টানা পেঁচানো	১	-	৭	-	৮
মোট	৮১	১৩	১৪১	২	২৩৭

উৎস : মাঠ জরিপ, ২০০১

উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা (উবিনীগ) ও প্রবর্তনা

উবিনীগ (UBINIG) এর ইংরেজী রূপ হচ্ছে "Policy Research for Development Alternative". এটি মূলত একটি "Policy Advocacy and Research Organization"-এর লক্ষ্য হলো উন্নয়নের কৌশল উদ্ভাবন এবং সামাজিক পরিবর্তন; যা জনগণের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবে এবং সামাজিক ও উৎপাদনশীল সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে।[১৮]

১৯৮৬ সালে টাঙ্গাইল তাঁতীদের সাথে উবিনীগ কাজ শুরু করে। টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার ও টাঙ্গাইল সদর থানার ২০টি গ্রামে উবিনীগের কার্যক্রম বিস্তৃত। গ্রামাঞ্চলে শিল্পায়নের

লক্ষ্যে উবিনীগ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। গ্রামীণ শিল্পায়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাঁত শিল্প বড় একটি মাধ্যম হতে পারে বলে উবিনীগ মনে করে। তাঁত শিল্পের মাধ্যমে তাঁতী ও নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের আয় বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন ও মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এর অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে উবিনীগের অধীনে ৫০০'র বেশি তাঁতী রয়েছে।

১৯৮৯ সালে উবিনীগের একটি প্রকল্প হিসাবে প্রবর্তনা (Prabartana) চালু হয়। প্রবর্তনা মূলত তাঁতীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র এবং এর মাধ্যমে তাঁতী ও ভোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। বর্তমানে দুই ধরনের তাঁতী প্রবর্তনার সাথে যুক্ত; স্বাধীন তাঁতী ও সদস্য তাঁতী। স্বাধীন তাঁতীরা প্রবর্তনা থেকে সব ধরনের সহায়তা নিয়ে উৎপাদন পরিচালনা করে এবং নিজেদের উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে থাকে। সদস্য তাঁতীরা প্রবর্তনা থেকে সহায়তা নিয়ে উৎপাদন করে পণ্য প্রবর্তনায় সঁরবরাহ করে। ১৯৯৭-৯৮ সালে মাত্র ৩২ জন নারী প্রাক-বুনন কাজে এবং ১৬ জন (৯ জন পুরুষ, ৭ জন নারী) বুনন কাজে যোগ দেয় প্রবর্তনায়। বর্তমানে (জুন, ২০০১ পর্যন্ত) ১৯৭ জন তাঁতী প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং ৩৯৪ জন নারী শ্রমিক প্রাক-বুনন কাজের সাথে যুক্ত। ১৯৭ জন তাঁতীর মধ্যে ৯৮ জন প্রশিক্ষণ, উৎপাদন উপকরণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও সরাসরি তত্ত্বাবধান সুবিধা গ্রহণ করে কাজ করছে। এরা "Project Component Weaver" হিসাবে পরিচিত। এদের অধীনে তাঁত রয়েছে ২২৮টি। অর্থাৎ একজন তাঁতীর কাছে গড়ে দুয়ের অধিক তাঁত রয়েছে। অন্যদিকে সমিতির সহায়তা নিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে স্বাধীনভাবে কাজ করছেন ১০জন তাঁতী; যাদের মধ্যে ৪জন নারী ও ৬ জন পুরুষ। এরা "Phased Out Weaver" হিসাবে বিবেচিত; এদের অধীন তাঁত আছে ৪৪৮টি।

সারণি -৪ : তাঁতভিত্তিক তাঁতীদের বিন্যাস

তাঁত সংখ্যা	তাঁতী সংখ্যা	মোট তাঁত সংখ্যা
১ সেট তাঁতের মালিক	৩৭	৩৭
২ সেট তাঁতের মালিক	২৭	৫৪
৩ সেট তাঁতের মালিক	২০	৬০
৪ সেট তাঁতের মালিক	৫	২০
৫ সেট তাঁতের মালিক	৩	১৫
৭ সেট তাঁতের মালিক	৬	৪২
মোট	৯৮	২২৮

উৎস: উবিনীগ প্রতিবেদন, ২০০১ (অপ্রকাশিত)

নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক পরিচিতি

নারী শ্রমিকের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার জানার জন্য বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্মীয় অবস্থান, বৈবাহিক অবস্থা, বাড়ীঘরের ধরন, পরিবারের ধরন, অভিভাবকের পেশা, আয় ইত্যাদি তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বয়স

সারণি-৫ : বয়সের ভিত্তিতে নারী শ্রমিকদের অবস্থান

বয়স	আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
<২৫	১৯	৩৮.০	১৩	২৬.০	৩২	৩২.০
২৫-৩৫	১৭	৩৪.০	১৬	৩২.০	৩৩	৩৩.০
৩৫-৪৫	১০	২০.০	১২	২৪.০	২২	২২
৪৫-৫৫	৪	৮.০	৮	১৬.০	১২	১২.০
৫৫+	-	-	১	২.০	১	১.০
মোট	৫০	১০০.০	৫০	১০০.০	১০০	১০০.০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০১

৫নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দুটো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বেশিরভাগ (৭৭%) নারী শ্রমিকদের বয়স ৪৫ বছরের মধ্যে। নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি ২৫-৩৫ বয়স কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি (৩৩%); ৩৫-৪৫ বয়স কাঠামোতে ২২%। ৫৫ বছরের পর কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা খুব কম এবং তা মাত্র ১%।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

সারণি-৬ : শিক্ষার ভিত্তিতে নারী শ্রমিকের অবস্থান

শিক্ষাগত যোগ্যতা	আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	১	২.০	৬	১২.০	৭	৭.০
সাক্ষর	১৫	৩০.০	১৩	২৬.০	২৮	২৮.০
প্রথম-পঞ্চম	১৯	৩৮.০	২০	৪০.০	৩৯	৩৯.০
ষষ্ঠ - দশম	১৩	২৬.০	১০	২০.০	২৩	২৩.০
এস.এস.সি	২	৪.০	১	২.০	৩	৩.০
মোট	৫০	১০০.০	৫০	১০০.০	১০০	১০০.০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০১

তাঁতী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্কুলে যাবার প্রবণতা কম। নারী শ্রমিকদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ২৮%, আর নিরক্ষর ৭%। তবে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো এরা শুধুমাত্র নিজেদের নাম স্বাক্ষর করতে পারে। অন্যদিকে ৩৯% নারী শ্রমিক পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে; ২২% দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। এস.এস.সি পাশ শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৩%।

বৈবাহিক অবস্থা

সারণি-৭ : বৈবাহিক অবস্থাভিত্তিক নারীর অবস্থান

বৈবাহিক অবস্থা	আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
অবিবাহিত	১০	২০.০	৮	১৬.০	১৮	১৮.০
বিবাহিত	২৭	৫৪.০	৩১	৬২.০	৫৮	৫৮.০
বিধবা	৩	৬.০	২	৪.০	৫	৫.০
তালাক প্রাপ্ত	২	৪.০	২	৪.০	৪	৪.০
স্বামী পরিত্যক্ত	৮	১৬.০	৭	১৪.০	১৫	১৫.০
মোট	৫০	১০০.০	৫০	১০০.০	১০০	১০০.০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০১

৭ নং সারণি থেকে দেখা যায় যে, বিবাহিতদের সংখ্যা সর্বাধিক (৫৮%)। অন্যদিকে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীর সংখ্যা ২৪%; বৈবাহিক অবস্থার এ' চিত্র উল্লিখিত নারী সমাজকে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কর্মে নিযুক্ত হতে বাধ্য করেছে। প্রবর্তনার সাথে যুক্ত নারীদের মধ্যে বিবাহিতদের সংখ্যা বেশি (৩১%); আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনে কর্মরত নারীদের (২৭%) তুলনায়। অন্যদিকে দেখা যায়, মোট নারী শ্রমিকদের ১৫% স্বামী পরিত্যক্ত।

বাড়ীঘরের ধরন

বাড়িঘরের ধরন কেমন তার দ্বারাও একটি পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলো বাস করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঁশ, কাঠ, টিন ও মাটির তৈরী ঘরে। একটি মাত্র ঘর ও তার সংলগ্ন এলাকাটুকু জুড়েই তাদের সীমানা। তাঁত কাজের সাথে যুক্ত নারী শ্রমিকদের ঘরগুলো ছোট ও নিচু প্রকৃতির। বেশিরভাগ শ্রমিকের মাত্র একটি থাকার ঘর আছে, সাথে কারও রয়েছে লাগোয়া খড় অথবা পাঠখড়ির তৈরী রান্নাঘর।

সারণি-৮ : বাড়িঘরের ধরন অনুযায়ী নারী শ্রমিকের অবস্থান

বাড়ীঘরের ধরন	আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
টিনের ঘর	১৭	৩৪.০	১৫	৩০.০	৩২	৩২.০
বেড়া/বাঁশের ঘর	১০	২০.০	১৩	২৬.০	২৩	২৩.০
ছন/পাটখড়ির ঘর	১৩	২৬.০	৯	১৮.০	২২	২২.০
আধাপাকা ঘর	২	৪.০	৩	৬.০	৫	৫.০
অন্যান্য	৮	১৬.০	১০	২০.০	১৮	১৮.০
মোট	৫০	১০০.০	৫০	১০০.০	১০০	১০০.০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরীপ, ২০০১

দরিদ্র এসব নারী শ্রমিকদের ঘরগুলো বেশিরভাগ (৩২%) টিনের তৈরি। প্রবর্তনার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা বসত ঘরের মধ্যেই তাঁতসামগ্রী স্থাপন করে কাজ করে। যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তারা (৫%) আধাপাকা বাড়ীতে বাস করে।

পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন অনুযায়ী নারী শ্রমিকদের মধ্যে দুই ধরনের পরিবার দেখা যায়, যথা একক (nuclear) ও যৌথ (joint) পরিবার। তবে বর্ধিত (extended) পরিবারও দেখা যায়। শ্রমজীবী নারীর পরিবারগুলোর মধ্যে ৭২% একক প্রকৃতির। এর মধ্যে প্রবর্তনার ৭৪% এবং আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনে কর্মরত ৭০% নারী শ্রমিকের পরিবার একক প্রকৃতির। অন্যদিকে ২৪% পরিবার যৌথ এবং মাত্র ৪% পরিবার বর্ধিত প্রকৃতির। দুটো এলাকার পরিবার কাঠামোর পার্থক্য খুব একটা নেই।

সারণি-৯ : পরিবারের ধরন অনুযায়ী নারী শ্রমিকের অবস্থান

পরিবারের ধরন	আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
একক	৩৫	৭০.০	৩৭	৭৪.০	৭২	৭২.০
যৌথ	১৪	২৮.০	১০	২০.০	২৪	২৪.০
বর্ধিত	১	২.০	৩	৬.০	৪	৪.০
মোট	৫০	১০০.০	৫০	১০০.০	১০০	১০০.০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০১

নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থান

বাংলাদেশের সামাজিক অনুশাসন ও মূল্যবোধ নারীকে গৃহস্থালী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে এবং কৃষিক্ষেত্রে ও ঘরে নারী উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকলেও তা উৎপাদনশীল কাজ হিসাবে গণ্য না করে "গৃহস্থালী" কর্মকান্ডের আওতায় ফেলে নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়। নারীর কাজের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে না পারার ফলে নারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; যা নারীর অধস্তন অবস্থার পেছনে ক্রিয়াশীল।[২১] অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভের আশায় নারী তাঁতশ্রমিকরা সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তাঁতের কাজ করছেন এবং কাজ থেকে ফিরেই সমস্ত গৃহস্থালী দায়িত্ব যেমন রান্না করা, কাপড় কাচা, বাড়ীঘর পরিষ্কার করা, সন্তান দেখাশোনা করা, তাদের খাবার দেয়া ইত্যাদি পালন করছেন। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভের আশায় তারা এভাবে তাদের উপর অর্পিত দ্বৈত কাজের দায়িত্ব পালন করছেন। নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থান নিরূপণের জন্য তাদের আয়-ব্যয় ও এর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, সঞ্চয় প্রবণতা, কাজে যোগদানের কারণ, পরিবারের ভরণপোষণ, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে নারী শ্রমিকের নিজস্ব মূল্যায়ন কি তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কাজে যোগদানের কারণ

বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের পর্দার মধ্যে রাখার প্রবণতা থেকে ঘরের বাইরে তাদের কাজ করার অনুমতি দেয়া হয় না। যুগের পরিবর্তনে ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে সামাজিক রক্ষণশীলতার কাঠামো অনেকটা ভেঙ্গে পড়ায় গ্রামীণ নারী বর্তমানে অধিক হারে কাজে যোগ দিচ্ছে। কাজের জন্য নারীর বাইরে আসা আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। এর পেছনে অনেক কারণ ক্রিয়াশীল।

সারণি-১০ : নারী শ্রমিকদের কাজে যোগদানের কারণ

কাজে যোগদানের কারণ	আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
পরিবারে কর্মক্ষম লোকের অভাব	১৮	৩৬.০	১২	২৪.০	৩০	৩০.০
সংসার খরচ যোগানো	১৬	৩২.০	১৭	৩৪.০	৩৩	৩৩.০
স্বচ্ছলতা লাভ	৮	১৬.০	১০	২০.০	১৮	১৮.০
নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিচয় লাভ	৭	১৪.০	৮	১৬.০	১৫	১৫.০
সময় কাটানো/শখে	-	-	১	২.০	১	১.০
অন্যান্য	১	২.০	২	৪.০	৩	৩.০
মোট	৫০	১০০.০	৫০	১০০.০	১০০	১০০.০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০১

বিভিন্ন কারণে তারা কাজে যোগ দিলেও মূল তাগিদটা ছিল অর্থনৈতিক। বেশিরভাগ (৩০%) নারী সংসারে উপার্জনক্ষম কোন ব্যক্তির অভাবে কাজে এসেছেন। এদের মধ্যে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্ত ও বয়স্ক নারীর সংখ্যা বেশি। মাত্র ১৫% নারী শ্রমিক বলেছেন নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে যোগ দিয়েছেন।

নারী শ্রমিকের আয় কাঠামো

হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নারী শ্রমিকদের যে কাজ করতে হয় (বুনন, প্রাক-বুনন) তাতে সময় বেশি লাগে, তবে এ কাজের জন্য তারা খুব কম মজুরী লাভ করেন। মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে নারী শ্রমিকদের মজুরী তথা আয় কাঠামোর যে চিত্র লক্ষ্য করা গেছে, তা তাদের জীবন ধারণের জন্য নগণ্য। শ্রমবাজারে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাগ ও মজুরী কাঠামোর কারণে নারী শ্রমিকরা স্বল্প মজুরী লাভ করে থাকে। তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত নারী শ্রমিক গড়ে মাসে উপার্জন করে ৫০০-২০০০ টাকা। এনজিও'র সাথে যুক্ত হবার পূর্বে অনেকের আয় ছিল শূন্যের কোঠায়; তাই মজুরী কম হলেও এটা তাদের অর্থনৈতিক অর্জন। নারী শ্রমিকদের আয় ১,৫০০-২,০০০ টাকা বেতন কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি এবং তা ২৫ শতাংশ। ১৯% নারী শ্রমিক মাসে ১,০০০-১,৫০০ টাকা এবং ১৮% নারী শ্রমিক ২,০০০-২,৫০০ টাকা আয় করে। অন্যদিকে ৫০০ টাকার নিচে আয় করে ৫% ও ৩,০০০ টাকার উপরে আয় করে ৮% নারী শ্রমিক। আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনে কর্মরত নারী শ্রমিকদের তুলনায় প্রবর্তনায় কর্মরত শ্রমিকদের বেতন তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রবর্তনার ২৪% নারী শ্রমিক মাসে ২,৫০০ টাকার বেশি আয় করতে পারে; আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনে এ'হার ১৮%।

নারী তাঁত শ্রমিকদের আয়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, অধিকাংশ নারীর (৬১%) আয় ২,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ; যা তাদের জীবনধারণের জন্য নগণ্য।

মাসিক ব্যয় কাঠামো

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণকে কষ্টকর করে তুলেছে। সময়ের সাথে সাথে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও দরিদ্র জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও আয় বাড়েনি সমানতালে। ফলে তাদের জন্য জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় প্রতিটি পরিবারের মাসিক আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে গেছে; এই বাড়তি টাকা যোগাড় করতে যেয়ে পরিবার প্রধানকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। এ' অবস্থায় নারী শ্রমিকদের আয় পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যয় করা হচ্ছে এবং তাদের আয় পরিবারের দারিদ্র লাঘব, চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বেশিরভাগ নারী শ্রমিক তাদের উপার্জিত অর্থ গৃহস্থালী প্রয়োজনে যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সন্তানের লেখাপড়া, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য ব্যয় করেন। বিবাহিত নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের স্বামীর উপার্জিত টাকায় অনেক সময় সংসারের খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। নারী শ্রমিক তার আয়ের টাকায় এই ব্যয় পূরণ করে থাকে। নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই (৬২%) তাদের মাসিক আয়ের প্রায় পুরোটাই সংসারের প্রয়োজনে ব্যয় করেন। এদের সংসারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি কোন অর্থ হাতে থাকে না। এদের অধিকাংশই পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী এবং বৈবাহিক অবস্থার দিক থেকে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্ত। অন্যান্যরা (৩৮%) সংসারের প্রয়োজনে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করলেও তার থেকে কিছু অর্থ সঞ্চয়, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, চিকিৎসা ও নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করেন।

শতকরা ৫৮ জন নারী তাদের আয়ের টাকা থেকে সামান্য পরিমাণ হলেও সঞ্চয় করেন। অন্য দিকে অনেক নারী শ্রমিক জানান, তাদের আয়ের টাকায় সংসার চলে না। ফলে মাঝে মাঝে ঋণ করতে হয়। কাজে যোগদানের পর তাদের ঋণের পরিমাণ কমেছে বলে তারা জানান। হঠাৎ কোন বড় ধরনের সমস্যা যেমন- অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, ছেলে-মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি পরিস্থিতিতে তারা ঋণ করেন।

গবেষণায় দেখা যায়, ৩২% নারী শ্রমিক তাদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে পরিবারের সম্পূর্ণ ভরণপোষণ করতে পারেন। যেসব পরিবারে নারীই প্রধান এবং পরিবারে উপার্জনশীল কোন পুরুষ সদস্য বা দ্বিতীয় কোন সদস্য নেই সেসব ক্ষেত্রে নারী এককভাবেই পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করেন; কোন কোন নারী শ্রমিক সম্পূর্ণ ভরণপোষণে সক্ষম হলেও অধিকাংশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা সংসারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না।

উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ

উপার্জিত অর্থের উপর নারী কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা উপার্জিত অর্থ কিভাবে ব্যয় করবে, কোন কোন খাতে ব্যয় করবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার উপর নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান, পারিবারিক, সামাজিক মর্যাদা অনেকাংশে নির্ভর করে। সনাতন নিয়মে নারীদের অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি স্বোপার্জিত অর্থের উপর থেকেও নারীর নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয়া হয়। তাঁতশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত নারী শ্রমিকরা তাদের উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা বা নিজের সিদ্ধান্ত মত অর্থ ব্যয় করতে পারে কিনা

তা অনুসন্ধানে দেখা যায়, শতকরা ৪১% ভাগ নারী শ্রমিকই উপার্জিত অর্থ নিজের কাছে রাখেন এবং নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করেন। শতকরা ৩৩ ভাগ নারী পরিবারের সদস্যদের সাথে যৌথভাবে আলোচনা করে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করেন এবং ২৫ শতাংশ নারী নিজের অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না; তারা স্বামী, বাবা-মা এদের হাতে অর্থ তুলে দেন।

সারণি -১১ : উপার্জিত অর্থর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও অর্থ ব্যয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা

নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজের নিয়ন্ত্রণ	২৩	৪৬.০	১৯	৩৮.০	৪২	৪২.০
যৌথ নিয়ন্ত্রণ	১৭	৩৪.০	১৬	৩২.০	৩৩	৩৩.০
পরিবারের নিয়ন্ত্রণ	১০	২০.০	১৫	৩০.০	২৫	৩৫.০
মোট	৫০	১০০.০	৫০	১০০.০	১০০	১০০.০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০১

নারী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন

সারণি-১২ : নারী শ্রমিকদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে মতামত

মতামত	আয়েশা আবেদ ফউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
সন্তুষ্ট	৩২	৬৪.০	৩৮	৭৬.০	৭০	৭০.০
সন্তুষ্ট নন	১৮	৩৬.০	১২	২৪.০	৩০	৩০.০
মোট	৫০	১০০.০	৫০	১০০.০	১০০	১০০.০

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০১

নারী শ্রমিকগণ নিজের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থানকে কিভাবে মূল্যায়ন করে, তা জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছিল তারা তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সন্তুষ্ট কিনা। এ প্রশ্নের জবাবে ৭০% নারী ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন। বাকী ৩০% নিজেদের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নন। পরিবারের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারায় নিজেদের স্বনির্ভর মনে করেন ২০% নারী। এছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় আয় কম, উপার্জিত অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকা ও সংসারের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে না পারার কারণে তারা বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থানে সন্তুষ্ট নন।

নারী শ্রমিকের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পদসোপানমূলক লিঙ্গীয় সম্পর্কের ভেতর বাংলাদেশের নারী সমাজ রয়েছে অধস্তন; তারা তাদের প্রকৃত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় পারিবারিক সামাজিক জীবন ব্যবস্থায় নারীর স্বাধীন মতামত প্রকাশের ও নিজস্ব জীবনের

উপর নারীর স্বাধীনতা উপভোগের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হচ্ছে। একজন নারী হিসেবে মতামতের দিক থেকে সে পিতৃগৃহে যেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না, তেমনি স্বামীর বাড়ীতেও নয়। এনজিও পরিচালিত হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সাথে সম্পৃক্ততা নারীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে যেমন প্রভাবিত করছে; তেমনি তা নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

নারীর গতিশীলতা

আমাদের সমাজে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করার মাধ্যমে নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেশিরভাগ গ্রামীণ নারীর স্বামীর বা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যের অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাইরে যাবার স্বাধীনতা নেই। অথচ নারীর গতিশীলতা (mobility) সমাজে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী। রিতা সেন এক গবেষণায় (১৯৯২) দেখান, "Women had no freedom to go outside without their husbands or the male member's consent".[১৯] তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত নারী শ্রমিকের গতিশীলতার চিত্র অন্যান্য গ্রামীণ নারীর চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। নারী শ্রমিকগণ দিনের পুরোটা সময় (সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টা) বাড়ীর বাইরে থাকেন কাজের জন্য। প্রবর্তনার সাথে যুক্ত নারী শ্রমিকরা বাড়ীতে বসে এবং সেই সাথে উৎপাদন কেন্দ্রে বসে কাজ করে থাকে। যেসব নারী শ্রমিক বাড়ীতে বসে কাজ করে তাদেরও নিয়মিতভাবে উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ, পণ্য ডেলিভারী দেবার জন্য উৎপাদন কেন্দ্রে আসতে হয়। কাজের জন্য বাইরে গেলে তারা বাধার সম্মুখীন হন না। নারী শ্রমিকদের সাথে কথা বলে দেখা গেছে, তারা কাজের জন্য নিয়মিত ঘরের বাইরে আসলেও কর্মক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও যেতে হলে পরিবার প্রধান/স্বামীর অনুমতি নিয়ে যান। নিজের ইচ্ছামত তারা যে কোন জায়গায় যেতে পারেন না। বয়স্ক নারী শ্রমিক চলাফেরার বাধানিষেধ থেকে বেশ খানিকটা মুক্ত হলেও কম বয়স্কদের প্রতি কঠোর বিধি নিষেধ রয়েছে। বিশেষ করে অবিবাহিত নারী শ্রমিকদের চলাফেরাকে তাদের পিতামাতা নিয়ন্ত্রণ করেন কঠোরভাবে।

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নারী

তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত নারী শ্রমিকদের পরিবারগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে নারী পুরুষ যৌথভাবে আবার কখনও নারী এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিয়ে থাকে।

সারণি-১৩ : কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আগে ও পরে পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন		প্রবর্তনা		মোট	
	আগে	পরে	আগে	পরে	আগে	পরে
স্বামী এককভাবে	২৩ (৫৭.৫)	৯ (২২.৫)	২৫(৫৯.৫)	১০(২৩.৮)	৪৮(৫৮.৫)	১৯(২৩.২)
স্ত্রী এককভাবে	২ (৫.০)	১৬(৪০.০)	৬(১৪.৩)	১৯(৪৫.২)	৮(৯.৮)	৩৫(৪২.৯)
যৌথভাবে	১৫(৩৭.৫)	১৫(৩৭.৫)	১১(২৬.২)	১৩(৩১.০)	২৬(৩১.৭)	২৮(৩৪.১)
মোট	৪০(১০০.০)	৪০(১০০.০)	৪২(১০০.০)	৪২(১০০.০)	৮২(১০০.০)	৮২(১০০.০)

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০১

সারণিতে নারী শ্রমিকদের কাজে যোগদানের আগে ও পরে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের হার দেখানো হয়েছে। কাজে যোগাদানের আগে মাত্র ৯.৮% ক্ষেত্রে নারী একক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতো; কাজে যোগদানের পর তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২.৭% এ উন্নীত হয়েছে। কাজে যোগদানের আগে ও পরে নারী শ্রমিকদের মধ্যে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রবণতা যথাক্রমে ৩১.৭% ও ৩৪.১%। ৪৮ জন (৪৮%) নারী পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করেন। ১৭% নারী শ্রমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন না বলে জানান। ৩৫% মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করেন।

উপসংহার

গ্রামীণ নারী যুগ যুগ ধরে তাঁতকাজের সাথে যুক্ত থাকলেও তাদের তাঁতী হিসাবে গণ্য করা হতো না। প্রথাগতভাবে ধরে নেয়া হয় যে, মেয়েরা তাঁতে বসতে পারে না। "মেয়েরা তাঁতে বসলে ঘর থেকে লক্ষ্মী চলে যাবে" এ ধারণা ছিল খুবই দৃঢ়। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়নে ব্র্যাক ও উবিনীগের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন ও প্রবর্তনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে নারী শ্রমিক যারা যুগ যুগ ধরে তাঁতকাজের সাথে যুক্ত থেকেও তাঁতী হতে পারেননি, তারা তাদের ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ পায়। আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন ও প্রবর্তনা নারী শ্রমিকদের তাঁতী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে; তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন। গ্রামীণ নারী তাঁতী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও নিম্ন মজুরী ও প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হতে পারেনি। সারা বছর পর্যাপ্ত কাজের সরবরাহ না থাকা, সময়মত তাঁতীদের মজুরী দিতে না পারা ও নিম্ন মজুরী হার নারী শ্রমিকদের স্বনির্ভর নারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধার সৃষ্টি করে।

তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত নারী শ্রমিকদের অর্থ উপার্জন তথা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করে কিনা তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, বেশির ভাগ নারী শ্রমিক মনে করেন অর্থ-উপার্জন তার অবস্থান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীর বাড়ির বাইরে বের হওয়া ও কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে যেসব সামাজিক বাধা ছিল তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাকে স্বীকার করা হয় না। তবে নারী শ্রমিকগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পারিবারিক পরিসরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের একচেটিয়া প্রাধান্যকে খর্ব করে অনেক নারী শ্রমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে। অর্থনৈতিক অর্জন পারিবারিক পরিসরে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে। পরিবারে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পুরুষ হলেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তারা নারী সদস্যদের সাথে পরামর্শ ও আলোচনা করে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন। বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত পৃথকভাবে বসবাসরত নারীর একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে; যা পরিবারে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্থনৈতিক অর্জন এসব নারী শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজে। গবেষণায় দেখা যায়, নারীর আয় পরিবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং পারিবারিক ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করেছে।

তথ্য নির্দেশিকা

Latif, Muhammad Abdul, Handloom Industry of Bangladesh:1947-90, University Press Limited, Dhaka, 1997, p.1.

Ibid. p.1.

Ibid. p.1.

Bhattachrjee, Debepriya and Khaled M, Markating of Small Industries Products in East Pakistan, Dhaka, Bureau of Economic Research, Dhaka, 1965, pp.1-2.

Latif, Muhammad Abdul, op. cit., p. 11.

Ibid. p.66.

Ibid., p.66.

Ibid., pp.66-71.

BBS, Report on Bangladesh Handloom Census 1990, Bangladesh Bureau of Statistics, January 1991, p.13.

Ibid.,p.13.

লতীফ, মোহাম্মদ আব্দুল, "বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা: ১৯৪৭-৮৭", বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৭ম খন্ড, ১৩৯৬, পৃ: ৬৯।

BRAC Annual Report : Training Division, BRAC, Dhaka,1999.

মুহাম্মদ, আনু, বাংলাদেশে উন্নয়ন সংকট ও এনজিও মডেল, প্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, পৃ: ১১৯।

BRAC Annual Report, BRAC, Dhaka,1999.

Ibid.

"Aarong", Access (BRAC News Letter), 8th issue, July, 1998.

BRAC Annual Report, BRAC, Dhaka,1999.

উবিনীগের কর্মকান্ডের কোন বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তথ্য সংগ্রহের জন্য উবিনীগ প্রবর্তনার কর্মকর্তা সদস্যদের সাক্ষাৎকার, উবিনীগের কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্যের সহায়তা নেয়া হয়েছে উবিনীগ সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে।

Sen, Rita, Social Constraints for Working Women : Notes from a Rural Area of Jamalpur, RED Research Report, BRAC, September 1992, P. 1.

ISSN 1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দশম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১২/নভেম্বর ২০০৫

পরিবেশগত সমস্যা ও টেকসই উন্নয়ন ধারণা এবং পরিপ্রেক্ষিত

মোঃ নুরুল আমিন*

Abstract: *Sound environment, co-existence between natural and social elements, is inevitable for the sustainability of humankind. Growth-centric and short-sighted development activities creat various environmental problems viz., greenhouse effect, overpopulation, global warming, acid rain, ozone detraction, deforestation, radiation, soil erosion, air pollution, water pollution, sound pollution etc. As a result, interrogation of environmental issues in development practices that is sustainable development is a must to meet the needs of present generation as well as future. Obviously, environment is a global issue. But, at present, environment- friendly development is very much important in developing countries than developed countries. By this time, most of the developing countries are going to use their natural resources for the people's socio-economic development by the techno-economical assistance of industrialist countries. In that case, developing countries have potentials to consider negative environment effects in development initiatives, which make their present as well as future live sustainable. So, sound conceptual understanding and consensus on livable environment vis-à-vis sustainable development is necessary among government, private sector and civil society both in developed and developing nations.*

ভূমিকা

মানুষের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পৃথিবীর বাস্তুসংস্থান ও জীব বৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়নের (sustainable development) ধারণাটি উন্নয়ন তত্ত্ব ও চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষকগণের মাঝে একটি দৃঢ় মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবেশগত বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। অথচ শিল্পোন্নত বিশ্বের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের সাহায্য দাতা গোষ্ঠীর নির্দেশিত নির্ভরশীল উন্নয়ন তত্ত্বে যুগ যুগ ধরে পরিবেশের ইস্যুটি ছিল উপেক্ষিত। উন্নয়নের উপরোক্ত সনাতনী ধারণার সম্পূর্ণ বিপক্ষে নয় বরং সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে পরিবেশের প্রতি সহনশীল উন্নয়নের তত্ত্ব হিসেবে টেকসই বা ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণাটির জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান পর্যালোচনায় প্রথমে পরিবেশ ধারণাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বিশ্বের সাধারণ পরিবেশগত সমস্যাসমূহের ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর টেকসই উন্নয়ন ধারণার পরিপ্রেক্ষিত অর্থ ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

পরিবেশের ধারণা

সাধারণভাবে পরিবেশ (environment) বলতে আমাদের যা কিছু বেষ্টন করে আছে তাকে বোঝায়। গাছপালা, নদীনালা, বাতাস, পানি, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়াদি যেমন পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত তেমনি পরিবার, কমিউনিটি, নগর, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ পৃথিবীর বুকে জীবসত্তা অথবা সমগ্রকের (population) ওপর প্রভাব বিস্তারকারী জীব ও জড় বিষয়াদি নিয়ে পরিবেশ গঠিত। ডেভিড ডি কেম্প বলেন, পরিবেশ বিভিন্ন ভৌত এবং জৈবিক উপাদানের একটি সমন্বয় যা কোন জীবসত্তার জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে (a combination of the various physical and biological elements that affect the life of an organism) (Kemp,1998: 127). অনুরূপভাবে হেনরী ডব্লিউ আর্ট ও অন্যান্য সম্পাদিত *The Dictionary of Ecology and Environmental Science (1993)* -এ বলা হয়েছে, পরিবেশ হলো: "The whole sum of the surrounding external conditions within which an organism, a community, or an object exists" (Art, 1993: 187). অতএব, পরিবেশ হল প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জীবসত্তা এবং মানুষ কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো যা জীবনের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এককথায় জীবসত্তা এবং তার পারিপার্শ্বিকতাই পরিবেশ। বৃহত্তর দৃষ্টিতে পরিবেশ দু'ভাগে বিভক্ত-প্রাকৃতিক (natural) এবং সামাজিক (social) পরিবেশ। অবশ্য বর্তমান আলোচনায় 'পরিবেশ' প্রত্যয়টি 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথিবীর বুকে সকল জীবনের বেঁচে থাকাকে সম্ভব করে তোলে। এর রয়েছে নিম্নোক্ত চারটি অংশ যেমন- বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল ও জীবমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল (atmosphere): বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে এমন সব গ্যাসের মিশ্রণ। যেমন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি; বারিমণ্ডল (hydrosphere) : বারিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান জলরাশি। যেমন- সাগর, নদী, ভূগর্ভস্থ পানি প্রভৃতি; অশ্মমণ্ডল (lithosphere) পৃথিবীর উপরিভাগে বিদ্যমান দৃঢ়, শক্ত ও কঠিন বহিরাবরণ। যেমন- পাহাড়, খনিজ প্রভৃতি; জীবমণ্ডল (biosphere) পৃথিবীর সেই অংশ যেখানে প্রাণীকুল বসবাস করে। বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর এবং অশ্মমণ্ডলের উচ্চস্তর নিয়ে জীবমণ্ডল গঠিত। এটি প্রায় দুই কিলোমিটার পুরু। এর অন্তর্ভুক্ত হল মানুষ, গাছপালা, কীটপতঙ্গ এবং প্রাণীকূল প্রভৃতি (Zimmerman, 2002: 9)। প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বাস্তুসংস্থান (ecosystem) রূপে কাজ করে। বাস্তুসংস্থান হল একটি প্রাকৃতিক কার্যকর একক যার মধ্যে উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব এবং মানুষ প্রভৃতি মাটি, পানি, বায়ু এবং খনিজ প্রভৃতি জড় পদার্থের সাথে পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখে।

অপরদিকে সমাজ হল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক ব্যবস্থা। মানুষ তার চাহিদা ও সুযোগ পূরণের জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তাই সামাজিক পরিবেশ। অধিকন্তু সামাজিক পরিবেশ মানুষের তৈরী সকল অবকাঠামো, দক্ষতা, জ্ঞান ও কৌশল, উৎপাদন পরিবার, কমিউনিটি, ধর্ম, মূল্যবোধ, প্রথা, রীতিনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রশাসন এবং রাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কেননা সামাজিক পরিবেশে সংগঠিত কর্মকাণ্ড প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর গভীর

প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সামাজিক পরিবেশে যদি ভোগ, বিলাসিতা, দুর্নীতি, দারিদ্র্য বৈষম্য বিরাজমান থাকে তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা এবং বিপর্যয় আবার সামাজিক পরিবেশে মানুষের জীবন ধারণকে অসম্ভব করে তোলে। সামাজিক পরিবেশের বহু কার্যক্রম প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে বহুবিধ পরিবেশগত সমস্যা।

পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশ একটি সমন্বিত বিষয়। অথচ শিল্পবিপ্লবের সাথে সাথে পৃথিবীর অবয়ব, বায়ুমণ্ডল এবং এর জলরাশির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং প্রযুক্তির বিকাশের পাশাপাশি অদূরদর্শী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ পরিবেশের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে যা সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত বিপর্যয় এবং প্রাণীকুলের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবেশ যার বাইরের কোন বিষয় নয়। নিম্নে সাম্প্রতিক বিশ্বের সার্বিক পরিবেশগত কিছু সমস্যা সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা (increasing population): বৈশ্বিক পরিবেশের অন্যতম একটি সমস্যা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জাতিসংঘের মতে, ১৯৯৪ সালের পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ৫.৬৩ বিলিয়ন যা ২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.২৩ বিলিয়ন হয়। ২০২৫ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৮.৪৭ বিলিয়ন (Zimmerman, 2002: 6)। তবে উন্নত দেশ অপেক্ষা উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে পৃথিবী একসময় মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

২. গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়া (greenhouse effect): ক্ষুদ্র তরঙ্গের সূর্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং ভূমির উপরিভাগ দ্বারা শোষিত হয়। আবার সূর্যরশ্মির বিকিরণের অধিকাংশই নির্গত হয়ে অবলোহিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে (infrared wavelengths) ফিরে যায়। কিন্তু তা পুনরায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজোন প্রভৃতি গ্যাসের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, এগুলো গ্রীনহাউজ গ্যাস নামে পরিচিত। কিন্তু মানুষের অদূরদর্শী কর্মকাণ্ড তথা বৃক্ষনিধন, জীবাশ্ম জ্বালানীর সীমাহীন ব্যবহার এবং দূষণের ফলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবেশগত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (Bynoe, 1998: 11)।

৩. বৈশ্বিক উষ্ণয়ন (global warming): পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি অন্যতম একটি পরিবেশগত সমস্যা। এর কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে জীবাশ্ম জ্বালানী যেমন-কাঠ, কয়লা, তেল, পেট্রোল প্রভৃতি অতিরিক্ত ব্যবহার এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে তৈরী গ্রীনহাউজ গ্যাস যেমন-কার্বন-ড্রাই অক্সাইড, মিথেন, সিএফসি প্রভৃতির ঘনত্ব বৃদ্ধি। ১৮৫০ সাল থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ১° সেন্টিগ্রেড (১.৮০ ফাঃ) বৃদ্ধি পায় (Leggett, 1990: 8)। এর ফলে মরু অঞ্চলে বরফের গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটছে যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

৪. অম্ল বৃষ্টি (acid rain)ঃ অম্ল বৃষ্টি বৃষ্টি ও জীবাশ্ম জ্বালানীর সাথে জড়িত। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র এবং যানবাহন থেকে সালফার ড্রাই-অক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হয় যা সূর্যরশ্মি, আর্দ্রতা ও অক্সিডেন্ট এর সাথে বিক্রিয়ায় মাধ্যমে সালিফিউরিক এবং নাইট্রেড তৈরী করে যা বায়ুমণ্ডলের প্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে বৃষ্টি, তুষারপাত এবং শুকনো আস্তরণ হিসেবে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটি অম্ল বৃষ্টি নামে পরিচিত। অম্ল বৃষ্টির ফলে ধাতুর ক্ষয়, প্রস্তর নির্মিত ভবন এবং স্মৃতিস্তম্ভের ক্ষয়, প্রাণীকুলের মৃত্যু এবং হ্রদ, ঝরণা এবং মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায় (Loggett, 1990: 19)।

৫. ওজোন স্তরের ক্ষয় (ozone destruction)ঃ ওজোন স্তর বায়ুমণ্ডলের এমন একটি স্তর যা পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি হতে রক্ষা করে। প্রায় ৪০ কি. মি. পুরু এই স্তর ব্যতীত কোন প্রাণীর পক্ষেই পৃথিবীর বুকে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন যা রেফ্রিজারেটর, শিতাতপ নিয়ন্ত্রক, পরিষ্কারক যন্ত্র, প্যাকেট তৈরীর উপাদান, কীটনাশক ছিটানোর যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে। এর ফলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করছে যা চামড়ার ক্যান্সার, চোখের ছানিপড়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি এবং মহাসাগরের উদ্ভিদকণার বৃদ্ধিকে ব্যাহত করছে। (Madar,1998: 478)।

৬. বিকিরণ (radiation)ঃ যদিও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ অধিকাংশ দেশ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে তথাপি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের বর্জ্য এবং পারমাণবিক দুর্ঘটনার মাধ্যমে (চেরনোবিল ১৯৮৬) পারমাণবিক বিকিরণ বায়ু এবং পানি দূষণের মাধ্যমে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। পারমাণবিক বর্জ্য রকমভেদে ৭০০ থেকে ১ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকতে পারে যা পরিবেশের সুদূরপ্রসারী ক্ষতিসাধন করতে পারে (Bynoe, 1998: 14)।

৭. বৃক্ষনিধন (deforestation)ঃ কোন দেশের মোট আয়তনের শতকরা পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নের নামে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং আমাজান নদীর তীরবর্তী বনভূমি কাঠ সংগ্রহ, শষ্যক্ষেত্র এবং পশুচারণ ক্ষেত্র নির্মাণ, জ্বালানী এবং আবাসনের জন্য ব্যাপকহারে ধ্বংস করা হচ্ছে। ১৯৮০ এর দশকে এই অঞ্চলে প্রতি মিনেটে ৫০ একর বনভূমি নিধন করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে ভূ-উপগ্রহের তথ্য অনুযায়ী আমাজান অববাহিকায় প্রায় ৫ হাজার বর্গকিলোমিটার বনভূমি ধ্বংস করা হয়। এর ফলে সাত লক্ষ প্রাণী ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। (Bynoe, 1998: 14)

৮. বায়ুদূষণ (air pollution)ঃ শিল্প এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন রাসায়নিক এবং সুক্ষ্ম উপকরণ যেমন-কার্বন, সালফার, নাইট্রোজেনের মিশ্রনের ফলে বায়ুদূষণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে নগর অঞ্চলে মোটরযান হতে নির্গত ধোঁয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাতাসে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় যা মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আবার সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মিশ্রণের ফলে বায়ুমণ্ডলে সালফিরউরিক এসিডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং অম্ল বৃষ্টি তৈরী হয়।

৯. পানিদূষণ (water pollution): জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেচ এবং শিল্পের প্রয়োজনে মানুষের পানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি রাসায়নিক সার, শিল্প বর্জ্য প্রভৃতির মাধ্যমে পানিদূষণ হচ্ছে। পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ গ্রামীণ জনগণ এবং ২০ শতাংশ নগর জনগোষ্ঠীর কোন বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। অনেক অঞ্চলেই পানিতে ক্ষতিকর বিষক্রিয়া (যেমন-আর্সেনিক) বিদ্যমান। প্রতিবছর বিশ্বের প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ পানিবাহিত রোগে মৃত্যুবরণ করে (Bynoe, 1998: 15)।

১০. ভূমিক্ষয় (soil erosion): পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় প্রায় এক পঞ্চমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ ফসলী ভূমিকে বিনষ্ট করে খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং জ্বালানী সংগ্রহের জন্য বৃক্ষনিধনের ফলে ভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ফার্ম, শিল্প, শহর, নগর, মহানগর গড়ে তোলার ফলে ভূমি ক্ষয় হচ্ছে। ভূমির ক্ষয়ের কারণে ভূমি উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং মরুকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার ভূমিক্ষয় লেক এবং জলাধারের গভীরতা নষ্ট করছে (Madar,1998: 482)।

উপর্যুক্ত বৈশ্বিক পরিবেশগত সমস্যা ও ইস্যুগুলোর পাশাপাশি রয়েছে ফসলের মাঠে কীটনাশকের ব্যবহার এবং এর ফলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, পরিবেশগত শরণার্থী (environmental refugee) সমস্যা, মানুষ কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহে বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃত্রিম মরুকরণ, জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি প্রভৃতি (Begum, 1988: 4)।

কোন অঞ্চল, দেশ, জাতি, নগর, মহানগর, কমিউনিটি এবং গৃহস্থালী কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর হয়েছে। জাপান ভিত্তিক ইনষ্টিটিউট ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ষ্ট্রাটেজিস-এর গবেষক ডঃ হরি শ্রীনিবাস পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি পরিবেশগত সমস্যার স্কেল প্রদান করেন। তাঁর মতে, এই স্কেল যথাযথ ক্ষেত্রে পরিবেশগত সমস্যার কারণ অনুসন্ধান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহল সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠু নীতি কৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে (Srinivas, 2002:11)।

টেবিল-১ : শ্রীনিবাস প্রদত্ত পরিবেশগত সমস্যার স্কেল

Water Pollution	Loss of habitat, biodiversity and species endangered	**Region/ Nation**	Soil erosion and increased salinity	Toxic run-off And acid rain
Amenity loss	Traffic congestion	**City**	Loss of heritage and historical buildings	Reduced property and building values
Flooding and surface drainage	Polluted land	**Community**	Inappropriate and inadequate technology use	Inadequate tax/financial revenues
Toxic and hazardous wastes/dump	Trash dumping	**Household** Household health, garbage generation, air/water/noise pollution, spread of diseases	Lack of understanding of environmental problems	Inappropriate laws and legislation
	flooding	Noise pollution	Natural Disasters	High living densities
Loss of agricultural land and desertification	Air pollution	Water Pollution	Inadequate supply and transmission loss of electricity	Misguided urban governments and management practices
Natural and man-made hazards and disasters		Land clearance and loss of forest cover		Effects of climate change and global worming

Source: Srinivas, 2002: 11

সুনির্দিষ্ট প্রতিটি স্কেল সমস্যার সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সেবাকেও নির্দেশ করে। পরিবেশগত সমস্যাকে সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে যথার্থভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে শ্রীনিবাসের স্কেলটি গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্ট স্কেলকে বিবেচনার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চিহ্নিত হয়:

- "Health impacts are greater and more immediate at the household or community level and tend to diminish in intensity as the spatial scale increases;
- Equity issues arise in relation to (a) the provision of basic services at the household or community scale and (b) intemporal externalities ate the regional and global scale particularly the intergenerational impacts implicit in non-sustainable resource use are global environmental issues; and
- Levels of responsibility and decision making should correspond to the scale of impact, but existing jurisdictional arrangements often violate this principle" (Srinivas, 2002:11)।

টেক্সই উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত

বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, নগর, কমিউনিটি এবং গৃহস্থালীর পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষাপটে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। মূলত মানুষের ক্রমবর্ধমান

চাহিদাসমূহ পূরণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের যে বিপর্যয় তা পরিবেশ ও উন্নয়ন বিতর্ককে জোরদার করে। বিশেষ করে অনবায়নযোগ্য সম্পদ (non-renewable resources) যেমন: তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি ক্রমশ নিঃশেষ হবার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের বিকশিত হয় এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়।

পরিবেশের অবক্ষয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা উন্নয়ন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। যেভাবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের পথ অন্বেষণ করা জরুরী। কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়নের তত্ত্ব ও প্রয়াস আমাদের কাঙ্ক্ষিত চিত্র তুলে ধরে না। সাধারণত উন্নয়নের লক্ষ্য হল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা যার নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে:

- "To increase the availability and widen the distribution of basic life sustaining goods such as food, shelter, health, and protection;
- To raise levels of living including in addition to higher income, the provision of more jobs, better education and greater attention to cultural and humanistic values, all of which will serve not only to enhance materials well-being but also to generate greater individual and national self-esteem;

- To expand the range of economic and social choices available to individuals and nations but freeing them form servitude and dependence not only in relation to other people and nation states but also to the forces of ignorance and human misery" (Todaro, 1985: 47)।

মিশেল পি টোডারো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর *Ecnonomic Development in the Third World (1985)* পুস্তকে বলেন, সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হল অসহায় মানুষের জন্য খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের অসহায়ত্ব দূর করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করা, অসমতা এবং দারিদ্র্য দূর করা। (Todaro, 1985: 85) প্রকৃত পক্ষে, উন্নয়নের প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক তত্ত্ব মুক্তবাজার এবং চুইয়ে পড়া (trickle down effect) নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন চর্চায় ব্যবহৃতও হয়। কিন্তু আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বিপর্যয়কর উপাদানসমূহকে বিবেচনায় আনা হয়নি। তবে প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেনি। বরং পরিবেশগত বিপর্যয়ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। আবার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ ও সরকারকে সম্ভাব্য আয় থেকে বঞ্চিত করেছে। এভাবে পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় দীর্ঘ মেয়াদীভাবে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের প্রয়াসকে ব্যাহত করছে। এর ফলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে পরিবেশের ইস্যুগুলো অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ বিবেচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে যা পরিবেশ সহায়ক টেকসই উন্নয়নের ধারণা নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা পূর্বেও পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালে জর্জ পারফিন্স মার্শ তাঁর *Man and Nature (1864)* পুস্তকে বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি আহবান জানান। পারফিন্স মার্শ গুরুত্ব আরোপ করেন যে, মানুষ পরিবেশের দুভার্গ্যজনক স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করছে। তাই বিপর্যস্ত পরিবেশকে প্রাকৃতিক উপায়ে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। তবে ১৯৩০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত চাষাবাদ ও অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক ভূমি ক্ষয় সাধন হয় এবং ১৯৫৩ সালে জাপানের মিনিমাতা বে ট্রাজেডীর ফলে নদীতে পারদ বিষক্রিয়ায় মাধ্যমে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় (Bynoe,1998: 2)। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক গুরুত্ব পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী রাসেল কারসন তাঁর *Silent Spring (1962)* শীর্ষক গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেন যে, মরুভূমি বা বনভূমির কোথাও দূষণমুক্ত নয়।

১৯৭২ সালে এমআইটি এর বিজ্ঞানীগণ *The Limits to Growth (1972)* শীর্ষক রিপোর্টে পরিবেশের ক্ষতি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ করার আহবান জানান। অতপর ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে মার্কিন সরকার প্রণীত *The Global 2000 Report (1980)* হবার পর জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৪ সালে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে দ্যা ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভাইরনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট গঠিত হয়। কমিশন ১৯৮৭ সালে *Our Common Future (1987)* শীর্ষক রিপোর্টে পরিবেশ সহায়ক টেকসই উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। পাশাপাশি ১৯৯২ সালের ব্রাজিলের রিওডিজেনিরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ধরিত্রী সম্মেলন এবং ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের বিশ্বসম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের প্রশ্নে টেকসই উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন : অর্থ ও বৈশিষ্ট্য

টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি সর্বপ্রথম ঐসকল অর্থনীতিবিদ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় যাঁরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন উদ্যোগে পরিবেশগত বিষয়াদিকে বিবেচনায় এনেছেন। প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক এই সকল উদ্যেগের মূল লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুফল লাভ করা। আর যা ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি সীমতি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পন্থা। কিন্তু ১৯৮০ -এর দশকে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি বহুমাত্রিকতা লাভ করে।

মূলত ১৯৮০ এর দশকে উন্নয়ন সংস্থা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড সমালোচিত হতে থাকে। তাঁদের মতে বিদ্যমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যোগে টেকসই হয়নি কারণ সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ ও সেবাসমূহকে বিবেচনায় আনা হয়নি। বস্তুত এরূপ উন্নয়ন বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের দারিদ্র্যের অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে মানব সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। উন্নয়নের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দু'টি মৌলিক উপাদান রয়েছে যা পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি হতে স্বতন্ত্র :

১. আর্থ-সামাজিক উপাদান (socio economic aspects): এর অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং মানুষের চাহিদাগুলো পূরণ করা;
২. পরিবেশগত উপাদান (environmental aspects): এর অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবকে পরিবেশের সামর্থ্যের মাঝে নিয়ে আসা (Bynoe, 1998: 10)।

দৃশ্যত টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি উন্নয়ন ডিসকোর্সে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। কেননা পরিবেশের ওপর উন্নয়নের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ ও উন্নয়নের সমন্বয় জরুরী হয়ে পড়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সংস্থা ও তাত্ত্বিকগণ কর্তৃক টেকসই উন্নয়নের বহুমাত্রিক সংজ্ঞা ও পদ্ধতি প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার এন্ড নেচারাল রিসোর্সেস (IUCN), জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এবং দ্যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ড (WWF) কর্তৃক World Conservation Strategy (1980) প্রকাশিত হয় যাতে তারা বাস্তুসংস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গিতে টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁদের মতে টেকসই উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

- To maintain essential ecological processes and life support systems;
- To preserve genetic diversity;
- To sustain utilisation of species and ecosystems (Bynoe,1998: 10)।

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে পক্ষপাতিত্বমূলকভাবে শুধুমাত্র পরিবেশগত বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকলেও আমরা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানকে অবহেলা করতে পারি না। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও টেকসই হয় না যদি উন্নয়ন নীতিতে সম্পদ আহরণের কৌশলের পরিবর্তন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে লাভ লোকসানকে বিবেচনা না করা হয়।

উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখানে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় অবশ্যই পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং উন্নত জীবনের জন্য সুযোগের গণতন্ত্রায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৩ সালে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রান্ডল্যান্ডকে সভাপতি করে গঠিত দ্যা ওয়ার্ল্ড কমিশন অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট তাঁদের *Our Common Future (1987)* শীর্ষক রিপোর্টে টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন : Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (WCED,1987: 43)।

কমিশনের রিপোর্টে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, পরিবেশ ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো স্বতন্ত্র নয় বরং সম্পর্কযুক্ত। উন্নয়ন অবনতিশীল সম্পদের ওপর ভিত্তি করে চলতে পারে না, আবার পরিবেশকেও সংরক্ষণ করা যায় না যখন উন্নয়নের পদক্ষেপে পরিবেশগত বিপর্যয়কে উপেক্ষা করা হয়। কার্যত টেকসই উন্নয়নের সাথে দুটি মৌল ধারণা সম্পৃক্ত :

- "The concepts of '*needs*': the concepts of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and

- The idea of '*limitations*': the idea a limitations imposed by the state of technology and social organization on the environments ability to meet present and future needs"(WCED,1987: 43) ।

টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্ধারণের পাশাপাশি কমিশন পরিবেশ সহায়ক উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়নের নীতিসমূহের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাতটি কৌশল নিধারণ করেন যা নিম্নরূপ :

- Riviving growth;
- Changing the quality of growth;
- Meeting essential needs for jobs, food, energy, water and sanitation;
- Ensuring a sustainable level of population;
- Conserving and enhancing the resources base;
- Reorienting technology and managing risk; and
- Merging environment and economics in decision making (WCED, 1987: 43)

এর পাশাপাশি উন্নয়ন ও পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও তাত্ত্বিকগণও টেকসই উন্নয়নকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আর পেপেটো টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, টেকসই হবার মৌল অর্থ হল বর্তমান সিদ্ধান্তগুলো যেন ভবিষ্যতের জীবনমান পরিচালনা অথবা উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন না করে। এটা বোঝায় যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এভাবে পরিচালিত হবে যার মাধ্যমে আমরা সম্পদের অংশীদারিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি (WCED,1987: 44)। একইভাবে ডি পিয়ার্স টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে বলেন, টেকসই উন্নয়ন হলো :

- Development subject to a set of constraints which set resource harvest rates at levels not higher than managed natural regeneration rate ; and
- Use of the environment as a "waste sink" on the basis that waste disposal rate should not exceed rates of managed or natural assimilative capacity of the ecosystem (Jalal, 2003: 1) ।

এম. মুনাসিংহে এবং ই. লুজ ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ সংক্রান্ত বিয়াল্লিশ নং কার্যপুস্তিকায় বলেন, টেকসই উন্নয়ন এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা জীবনযাত্রার মানের ক্রমবর্ধমান অগ্রতির পাশাপাশি সম্পদের সীমিত ব্যবহারকে অনুমোদন করে, যাতে করে আগামী প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ও বস্তুগত সম্পদ মজুদ বা বৃদ্ধি করা যায়। একইভাবে ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন (১৯৯৩) টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন :

> "Sustainable development means achieving a quality of life which is socially desirable, economically viable, and ecologically sustainable that can be maintained for many generations" (Jalal, 2003: 2)

আবার বিশ্বব্যাংক তাঁদের *World Development Report (1992)* -এ বলেন টেকসই উন্নয়ন হল লাভ-ক্ষতির পর্যালোচনা ও সতর্ক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উন্নয়ন এবং পরিবেশগত নীতি প্রণয়ন যা পরিবেশ সংরক্ষণকে জোরদার করবে, এবং কল্যাণকে আরও এগিয়ে নেওয়া ও টেকসই করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে (Jalal, 2003: 3)।

অপরদিকে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে The Rio Declaration on Environment and Development (১৯৯২) শীর্ষক ঘোষণায় টেকসই উন্নয়নের সাতাশটি নীতি ঘোষণা করা হয় (UN,1992: 2)। এ ঘোষণার চতুর্থ

নীতিতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় : "In order to achieve sustainable development, environmental protection should constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it" (UN,1992: 2) ।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাগুলো বিশ্লেষণ করলে টেকসই উন্নয়নের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। টেকসই উন্নয়ন পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া; এটি আঞ্চলিক, জাতীয়, স্থানীয়, নৃতাত্ত্বিক, এবং সাংস্কৃতিক বিবেচনা করে; এতে উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়; এটি প্রকৃতির সাথে ঐক্য ও সহাবস্থানকে নির্দেশ করে এবং টেকসই উন্নয়নে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উপসংহার

টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, সুষ্ঠু ও নির্মল পরিবেশ মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়া, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, অম্লবৃষ্টি, ওজোন স্তরের ক্ষতি, বিকিরণ, বৃক্ষনিধন, বায়ুদূষণ, শব্দ দূষণ, ভূমি ক্ষয় প্রভৃতি সমস্যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে। পরিবেশর ক্ষতি সাধন করে উন্নয়ন করা হলে তা হবে ধ্বংসাত্মক। এর অর্থ এই নয় যে মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে যাওয়া। বরং উন্নয়নের ধারাকে বংশ পরম্পরায় চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক, যৌক্তিক ও সতর্ক ব্যবহারই টেকসই উন্নয়নের মৌল প্রস্তাবনা। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের ভোগ ও বিলাসে নিবেদিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি দায়ভার আছে যা চূড়ান্ত বিচারে পরিবেশ বিশেষত প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বহন করতে হয়। তাই সতর্ক পদক্ষেপই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণে সহায়ক হতে পারে। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহের মানুষের নিরাপদ ও সমৃদ্ধ জীবন যাত্রার জন্য ইতোমধ্যেই পরিবেশকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহ যেখানে উন্নয়ন এখনো ধীর গতিসম্পন্ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে ব্যবহৃত হয়নি সেখানে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর কথা বিবেচনায় এনে প্রাকৃতিক সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এ-জন্য টেকসই উন্নয়নের ধারণাটির প্রসারের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রত্যাশী সরকার, ব্যক্তিখাত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সিভিল সোসাইটির মধ্যে পরবর্তী বংশধরদের জন্য আবাসযোগ্য ধরণী নির্মাণের জন্য ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা জরুরী।

তথ্য নির্দেশিকা

Art, Henry W. et.al. (eds.). 1993. The Dictionary of Ecology and Environmental science, New York: Henry Holt and Company.

Begum, Khurshida, 1998. Tension Over Farakka Barrage: A Techno-Political Trangle in South Asia, Stuttgart: Steiner Verlag Wiesbaden GmbH.

International Labour Organization. 1976. Employment, Growth and Basic Needs: A One World Approach, Geneva: ILO.

Kemp, David D. 1998. The Environment Dictionary, New York: Routledge.

Leggett, Jeremy (ed.). 1990. Global Warming: The Greenpeace Report, New york: Oxford University Press.

McGraw-Hill, 1992. McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, New York: McGraw-Hill.

Madar, Silvia S. 1998. Biology, New York:WBC/ Mc Graw-Hill.

MacIver, R. M. and Page, C. H. 1972. Society: An Introductory Analysis, London: Oxford University Press.

Meadows, D. H. et.al. 1992. Beyonds the Limits, London: Earthscan.

Rostow, W. W. 1960. The Stage of Economic Growth, New Haven: Yeal Press.

Srinivas, Hari. 2002. "Environment", e-Learn for Sustainable Development, Tokyo: Institute for Global Environmental Studies.

Todaro, Michael P. (ed.). 1985. Economic Development in the Third World, New York: Longman.

United Nations, The Rio Declaration on Enviornment & Development, 1992, Rio Henereo:UN.

World Commission for Environment and Development. 1987. Our Common Future, New York: Oxford University Press.

Zimmerman, Michael. 2002. "Environment", Microsoft Encarta Encyclopedia, New York: Microsoft Corporation.